শক্তিমত্ততা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ

আহসান মোহাম্মদ

১.
ছেলে-মেয়ে যে বুঝতে শিখছে তা তাদের অবুঝের মত প্রশ্ন শুনেই বোঝা যায়। কখনো কখনো জানা উত্তর এড়িয়ে যেতে হয়, কখনো বা ঘুরিয়ে জবাব দিতে হয়। অনেক প্রশ্নের উত্তর ভালো করে জানি না। তখন উত্তর খুঁজে তারপর তাদের মত করে বোঝাতে হয়। ইন্টারনেটের কল্যাণে উত্তর খোঁজাটা অবশ্য কিছুটা সহজ হয়েছে। প্রশ্ন করে তারা দুজনে মিলে এবং নিজেদের মধ্যে বিস্তর আলাপ-আলোচনার পর। ফলে কোন রকমে গোঁজামিল দিয়ে পার পাওয়া বেশ কঠিন। কয়েকদিন আগে তারা জানতে চাইলো যে বাঘ ও সিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী ও হিংস্র হওয়া সত্ত্বেও বনে বাঘ ও সিংহ ছাড়া অন্য প্রাণী যেমন হরিণ টিকে থাকে কি করে? সকল হরিণ কি বাঘের পেটে চলে যাবার কথা নয়?

ছেলে-মেয়ের প্রশ্ন শুনে নিজের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। পৃথিবীতে এখনও মানুষের বংশধর, বিশেষ করে যাদের মারণাস্ত্র নেই তারা কিভাবে বেঁচে রয়েছে? মানব সমাজের অধিকাংশ সদস্যই নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয়। অপরদিকে বার বার হালাকু খা, চেঙ্গিস খা, হিটলার, টিক্কা খান, ইসরাইলী শাসকগণ ও বুশের মত কশাইরা পৃথিবীতে এসেছে। আগেকার যুগের নরহত্যাকারীদের দুহাতেই অস্ত্র থাকতো। তারা অস্ত্র দিয়েই সবকিছু দখল করার চেষ্টা করতো। কিন্তু বর্তমানে তাদের এক হাতে থাকছে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র, আরেক হাতে গণমাধ্যম। এক হাতের অস্ত্র দিয়ে তারা হত্যা করে, অপরহাতের গণমাধ্যম দিয়ে নিজেদেরকে মানবতার ত্রাণকর্তা ও আহত-নিহতদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে প্রচার করে। নির্যাতিতরা মারও খায় আবার সকলের ঘৃণাও কুড়ায়। শক্তিমত্তদের ভয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে যেমন কেউ এগিয়ে আসে না, তেমনি গনমাধ্যমের প্রচারণার কারণে তাদের প্রতি সমবেদনাটুকুও মানুষের মধ্যে জন্মাতে পারে না। ওসামা বিন লাদেনকে ধরার অজুহাতে আফগানিস্তান দখল করে নেয় আমেরিকা ও বৃটেন। তারা সেখানে বর্বরতম গণহত্যা চালায়। একদিকে একটি স্বাধীন দেশের হাজার হাজার মানুষ ক্লাস্টার বোমার আঘাতে পিপড়ার মত মারা গেছে, অপরদিকে সারা বিশ্ব তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসাবে জেনেছে। সে সকল দুর্ভাগা মানব সন্তানদের জন্য সামান্য সমবেদনা প্রকাশের মত কেউ তখন ছিল না। একই ঘটনা ঘটে চলেছে ইরাকে ও ফিলিস্তিনে। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এর পরও নিরস্ত্র ও শান্তিকামী মানুষদেরকে দীর্ঘদিনের জন্য দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা তো দূরে থাক। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের জনগণ দখলদারী সেনাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল, ফিলিস্তিনের জনগণ এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, ইরাকে তো দখলদারী শক্তিকে তাদের সমর ও মিডিয়া শক্তি সত্ত্বেও দিনের পর দিন পর্যুযস্ত হতে হচ্ছে। এটি কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? তাহলে কি অস্ত্র, অর্থ, সংঘশক্তি ও মিডিয়া - এগুলোই সব কিছু নয়? এর বাইরেও কি কোন ব্যবস্থা প্রকৃতি করে রেখেছে শক্তিমত্ত ও হিংস্র প্রকৃতির ব্যক্তি, দল ও জাতির হাত থেকে নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় মানবসন্তানদের রক্ষা করার জন্য?

পৃথিবীতে দুর্বল প্রাণী এবং নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় মানুষের টিকে থাকার পিছনে সম্ভবতঃ একটি প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর রক্ষাকবচটি মানুষের থেকে ভিন্ন। হিংস্র মাংসাশী প্রাণীদের আক্রমণে তৃণভোজী দুর্বল প্রাণীদেরকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শক্তিমত্ত ও হিংস্র প্রাণীর বংশবৃদ্ধি হয় কম। অপরদিকে দুর্বল ও শান্তিপ্রিয় প্রাণীদের

বংশবৃদ্ধির হার অনেক বেশী। এখানে দুর্বল প্রাণীদেরকে হত্যা করা থেকে মাংসাশীদেরকে বিরত রাখার কোন ব্যবস্থা প্রকৃতি করেনি কারণ প্রকৃতিই তৃণভোজী প্রাণীদেরকে তৈরী করেছে মাংসাশী প্রাণীদের খাবার হিসাবে।

মানুষের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রক্ষাকবচটি একটু ভিন্ন ধরণের। প্রকৃতি চায় না মানুষ হিংস্র হোক, অন্য মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন করুক। শক্তিমত্ততা ও হিংস্রতা ঠেকাতে প্রকৃতি মানুষের মধ্যে দিয়েছে বিবেকবোধ, সাহস ও প্রতিরোধের ক্ষমতা। এগুলোর সম্মিলনে নিরস্ত্র মানবগোষ্ঠীও শক্তিশালী প্রতিরোধবূহ্য গড়ে তুলতে পারে। বিবেকবোধের কারণে মানুষ ভালোকে ভালো ও খারাপকে খারাপ হিসাবে বুঝতে পারে এবং অন্যায়, হিংস্রতা ও শক্তিমত্ততাকে অপছন্দ করে। সাহসিকতা ও প্রতিরোধের ক্ষমতার কারণে শান্তিপ্রিয় মানুষেরাও তাদের পরিবার পরিজন, সহকর্মী ও নিজ দল ও জাতির মানুষকে রক্ষা করার জন্য সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আরেকটি রক্ষাকবচ হচ্ছে একদলকে দিয়ে অরেক দলকে দমন করা। হিটলারকে কোন নিরস্ত্র মানুষের দল দমন করতে পারেনি, করেছে অরেকটি শক্তি। নেপোলিয়নের মত অনেকের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছে। এরপরও যখন শক্তিমত্ত ও হিংস্র কোন মানব গোষ্ঠীর নিকট থেকে শান্তিপ্রিয় মানুষদেরকে রক্ষা করা যায় না তখন আল্লাহর গজব নেমে আসে। ধর্মগ্রন্থগুলো এ ধরণের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে শক্তি, অর্থ ও প্রচারমাধ্যম একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। যার শক্তি আছে সে অর্থ এবং প্রচারমাধ্যম করায়ত্ব করে। একইভাবে অর্থ দিয়ে শক্তি ও প্রচারমাধ্যম ক্রয় করা বা প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে অর্থ ও শক্তি অর্জন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে পুজিবাদী অর্থনীতির যুগে বিষয়টি আরও বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের কারণে হিংস্রতা ও শক্তিমত্ততা যখন একটা সীমারেখা অতিক্রম করে তখন মিডিয়ার প্রচারণা দিয়েও তাকে ঢেকে রাখা যায় না। সীমা অতিক্রমকারী অপরাধীরা তখন আর প্রকাশ্য অপরাধ সংঘটিত করতে দ্বিধা করে না। কোন অপরাধ যখন প্রকাশ্যে ঘটতে থাকে, তখন তার দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাকে সে নিজেরই প্রচার করে বেড়ায়। এর থেকেও বিপদজনক হচ্ছে প্রকাশ্য অপরাধকে বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখনী, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড - ইত্যাদির মাধ্যমে সমর্থন দেয়া এবং তাকে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আদর্শ ও মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করা। যখন বলা হয় যে এ হত্যাকান্ডটি হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে বা আমাদের ধর্মকে রক্ষা করতে তখন সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষ সে ধরণের অপরাধ সংঘটিত করার বিষয়ে উৎসাহী হয় এবং একটি ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। এ ধরণের অবস্থায় প্রকৃতি তার অতি প্রিয় মানব প্রজাতিকে রক্ষার জন্য তার সবথেকে কঠিন রক্ষাকবচগুলো প্রয়োগ করে যা শক্তিমত্তদের জন্য বেদনাদায়ক হয়ে থাকে।

২.

বাংলাদেশী জাতির জীবনে বার বার এমন সময় এসেছে যখন মনে হয়েছে এ দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ বোধহয় আর টিকে থাকতে পারবে না। তখন কোন না কোন প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ তাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং হত্যাকারীদেরকে পরাস্ত করেছে। অনেকে বলেন অসংখ্য পীর আওলিয়া এদেশের মাটিতে শুয়ে আছেন। তাদের কারণে আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে এ দেশের প্রতি। এ মহাবিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছে তাঁরই হাতে গড়া প্রাণীদের থেকে প্রিয় কিছু নেই। তার মধ্যে আবার প্রিয়তম হচ্ছে মানুষ। তাই হিংস্র ও শক্তিমত্তদের হাতে নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের জীবন ও জীবিকা যখন বিপন্ন হয় তখন প্রাকৃতিক রক্ষাকবচগুলো তাদেরকে বাঁচিয়ে দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে এ দেশের নিরস্ত্র জনগণের

উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পৃথিবীর সবথেকে সেরা সেনা বাহিনীগুলোর একটি। আমরা আমাদের অনেক বীর সন্তানকে হারিয়েছিলাম বটে কিন্তু সেই হিংস্র ও শক্তিমত্তদেরকে পরাজিতও করেছিলাম। স্বাধীনতার পরও আরেকটি হিংস্র ও শক্তিমত্ত বাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল এবং তখনও মনে হয়েছিল যে এর থেকে বাঁচার আর কোন পথ নেই। প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ আমাদেরকে তখনও রক্ষা করেছিল।

এইতো মাত্র কিছুদিন আগে যখন বাংলাদেশের একটি বাদে সকল জেলায় একযোগে সিরিজ বোমা হামলা হয় তখন হতভম্ব হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। তার রেশ কাটতে না কাটতে একের পর এক আত্মঘাতি বোমা হামলা শুরু হলে জাতি দিশেহারা হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের জন্য সময়টা ছিল জাতির ইতিহাসের সবথেকে ক্রান্তিকাল। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর না আছে আধুনিক সরঞ্জাম, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর না আছে নৈতিক মান। এরকম একটি পরিস্থিতিতে যখন একদল লোক নিজেদেরে শরীরে বোমা বেঁধে বিচারকের এজলাস, জনাকীর্ণ প্রশাসনিক দফতর ইত্যাদিতে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করলো তখন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বললেন যে, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে আত্মঘাতি হামলা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের নারকীয়তা বেশীদিন চলেনি। তারা শুধু যে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তাই নয় বরং তারা যুগ যুগ ধরে এ জাতির ঘৃণা ও অভিসম্পাত বহন করতে থাকবে।

বিগত সরকার ক্ষমতা ছেড়ে দেবার সময়ে হিংস্রতা ও শক্তিমত্ততা প্রদর্শনের আরেকটি অধ্যায় শুরু হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণের পর সারা দেশব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। লাঠি-বৈঠা, বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা ঝাপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের উপর। বহু মানুষকে আহত ও নিহত করা হয়, ঘর, বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করা হয় এবং সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ঈদের ছুটি শেষে রাজধানীতে ফেরতরত যাত্রীদের গাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং তাদের উপর লুটপাট চালানো হয়। আগুন থেকে বাঁচার জন্য পলায়নরত গাড়ীর নিচে চাপা পড়ে নিহত হয় দুজন নারী যাত্রী ও এক শিশু। তবে নরহত্যার সব থেকে বীভৎস যজ্ঞটি চালানো হয় তারপরদিন ২৮ নভেম্বর বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে। টিভি ক্যামেরার সামনে লাঠি-বৈঠা দিয়ে এক তরুণকে পিটিয়ে হত্যা করার পর তার মৃতদেহের উপর উঠে নৃত্য করা হয়। সংবিধান অনুযায়ী যিনি একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান হবার কথা তাঁকে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণে বাধা দেবার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই এ ধরণের সহিংসতা ঘটানো হয়। রাজনীতির সাথে একেবারেই সংশ্লিষ্ট নয় এ ধরণের নাগরিকদেরকেও পৈশাচিক কায়দায় নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। সাভারে বাস যাত্রীকে পেটে রড ঢুকিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে অবরোধকারীরা। সারাদেশে ত্রিশজনেরও বেশী নাগরিক এ সহিংসতায় প্রাণ হারান, আহত হন কয়েক হাজার।

কয়েক দিনে সহিংসতা কমে আসে বটে কিন্তু হিংস্রতা ও শক্তিমত্ততার আরেকটি অধ্যায় শুরু হয়। যারা সন্ত্রাসের বিষাক্ত সাপকে জনগণের প্রতি লেলিয়ে দিয়েছিলেন তারা তাদের কর্মকান্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কিংবা অনুতাপ করা তো দূরে থাক, এটিকে তাদের সংঘশক্তি ও গণসমর্থন হিসাবে প্রচার করেন এবং তাদের দাবীর ক্রমাগত বর্ধিত তালিকা না মানা হলে এ ধরণের ঘটনা আবারো ঘটানোর হুমকী দিতে থাকেন। অত্যন্ত দম্ভভরে তারা এখনো বলে চলেছেন যে, তাদের কথা মতো না চললে দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে ও দেশ অচল করে দেয়া হবে। সংবিধানের ব্যাখ্যা দেবার নামেও চলছে শক্তিমত্ততা ও ঔদ্ধত্ব প্রদর্শনের নগ্ন মহড়া। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে জোরপূর্বক অপসারণ করা যায় কিনা এ ধরণের প্রশ্নের জবাবে 'সংবিধান বিশেষজ্ঞ', আওয়ামী আইনজীবি পরিষদের নেতা, আওয়ামী লীগ থেকে কুষ্টিয়ার একটি আসনে নির্বাচন প্রার্থী ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বললেন যে সরকার চাইলে নির্বাচন কমিশনারদের

নিরাপত্তা তুলে নিতে পারে (যাতে অফিস পর্যন্ত পৌছানোর পূর্বেই বৈঠাঘাতে তাদেরকে অন্য লোকে পাঠিয়ে দেয়া যায়), তাদের বাড়ি-গাড়ি নিয়ে নিতে পারে এবং তাদেরকে অন্য যে সকল ব্যাক্তিগত ও দাপ্তরিক সহায়তা দেয়া হয় সেগুলো প্রত্যাহার করে নিতে পারে। এ রকম অবস্থায় তাদের পদত্যাগ ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। তার দুদিন পর তিনি বলেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণ পদত্যাগ না করলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। অপরদিকে যারা সুশীল সমাজ উপাধি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মিডিয়াতে অতি সক্রিয় থাকেন তারাও সময় বুঝে তাদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে শক্তিমত্ততা প্রদর্শনের এ মহড়ায় অংশ নিয়েছেন। তাদেরকেও বলতে শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত ধরণের সমাধানের কথা, যেমন 'সরকার চাইলে তাদেরকে অফিসে ঢুকতে দিবে না।' চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে পদত্যাগ করানোর কথা তো উপদেষ্টা মহোদয়েরা পর্যন্ত অবলীলাক্রমে বলে বেড়াচ্ছেন। অথচ, আমাদের সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে প্রশাসন থেকে স্বাধীন রাখার ব্যবস্থা করেছে এবং তাদেরকে যেন চাপের মুখে মাথা নত না করতে হয় তার ব্যবস্থা রেখেছে। তাঁরা দায়িত্ব নেয়ার সময় শপথ নেন যে ভয়, ভীতি, অনুরাগ ও বিরাগের উর্দ্ধে উঠে তাঁরা কাজ করবেন এবং কোন প্রকার চাপের নিকট নতি স্বীকার করবেন না।

দেশের একটি প্রধান দলের হিংস্রতা ও শক্তিমত্ততা প্রদর্শন এবং বুদ্ধিজীবিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের তার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনের কারণে দলটির সাধারণ কর্মী সমর্থকদেরকেও প্রকাশ্যে হত্যাকান্ডের মত নৃশংসতার পক্ষে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। সহকর্মী কিংবা প্রতিবেশীদের সাথে আলাপচারিতায়, পাড়ার দোকানের আড্ডায়, এমনকি ইন্টারনেট ফোরামগুলোতে খোলামেলাই তারা এ হিংস্রতাকে সমর্থন করছেন। সেকুল্যার মতবাদের প্রচারক একটি বাঙ্গালী ইন্টারনেট ফোরামে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, 'দেশে একটি যুদ্ধ চলছে, এখন সেখানে হত্যাকান্ড আইনসিদ্ধ।' দেশে যুদ্ধ চলছে না। কিন্তু হত্যাকান্ডকে আইন সিদ্ধ ঘোষণা করে প্রচারণা চালিয়ে দেশকে একটি যুদ্ধের দিকেই ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। সমর ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক লিখেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, টিভিতে এ দৃশ্য (বৈঠাঘাতে হত্যা করে মৃতদেহের উপর উপর নৃত্যের দৃশ্য) দেখে আমি অখুশী হই নি। এ রকমটি না করা হলে কে এম হাসানকে অপারগতা প্রকাশ করাতে বাধ্য করা যেতো না। তাছাড়া জামাতীদেরকে ঢাকার রাজপথ থেকে মেরে তাড়িয়ে দেয়া গেলে তাদেরকে সারা দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যেতো (যেমনটি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে) এবং তাদের উপর একটা সিভিল ক্রাক ডাউন করা যেতো। সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনে তারা কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারতো না।'

৩.

বরাবরের মতই জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভাবছে যে বর্তমানের এই হিংস্রতা ও শক্তিমত্ততার পথ থেকে আর বুঝি মুক্তির কোন পথ নেই। তবে একটু গভীরভাবে গত কয়েকদিনের ঘটনাবলীকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে প্রাকৃতিক রক্ষাকবচগুলোর কিছু কিছু ইতোমধ্যে কাজ করেছে যার ফলে শক্তিমত্তরা তাদের হিংস্রতা ও লাঠি-বৈঠা অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও লুকিয়ে ফেলেছে।

সমর ঘোষ নামের ভদ্রলোক পূর্বে উল্লিখিত ইন্টারনেট ফোরামে আরও লিখেছেন, 'কিন্তু দেখা গেল পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পরিকল্পনা মাফিক হয় নি। যেখানে ২৮ অক্টোবর দুপুর পর্যন্ত সারা দেশ মূলতঃ আওয়ামী লীগের দখলে ছিল, সেখানে বিকাল থেকে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করলো। আমরা তাদেরকে রাজপথ থেকে তাড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হই। তারা তাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও প্রতিরোধ গড়ে তোলো ও সুদৃঢ় অবস্থান বজায় রাখে। এ ঘটনা বিএনপি-জামায়াতকে সারাদেশে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে

সাহায্য করে এবং ২৯ তারিখে তারা দেশের অনেক স্থানের রাজপথ দখলে নিয়ে নেয়। আমার মনে হয় না এ ঘটনা আওয়ামী লীগকে স্বল্প বা দীর্ঘ - কোন মেয়াদেই সাহায্য করেছে।'

যারা ২৭ অক্টোবর থেকে ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছিলেন তাদের নিকট সমর ঘোষের বক্তব্য সত্য মনে হতে পারে। ২৮শে অক্টোবর সকাল থেকেই টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখা যাচ্ছিল পল্টন, মুক্তাঙ্গন, জিরো পয়েন্ট, দৈনিক বাংলার মোড় - চারিদিকে লাঠি ও বৈঠা নিয়ে লোকে লোকারণ্য। অনেক ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রধারীও তাদের মধ্যে ছিল। তাছাড়া যে বৈঠাগুলো ছিল সেগুলি সাধারণ বৈঠা নয়, সেগুলিকে বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছিল। নিচের বাঁকানো অংশকে অস্ত্রের মত ধারালো করা হয়েছিল। ক্যামেরার সামনে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে উল্লাস প্রকাশ করার পর অনেকেই ধারণা করছিলেন যে চারিদিকে হাজার হাজার হিংস্র, শক্তিমত্ত সশস্ত্র ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দলের কয়েক শত কর্মী সমর্থকের কেউ আর জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। নির্বিকারভাবে দূরে দাড়িয়ে থাকা পুলিশের হাসি দেখে এ ধারণা জোরালো হচ্ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে চারিদিকে একদল শক্তিমত্ত ও হিংস্র বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার পরও তারা সকলে মারা যায় নি এবং তাদেরকে সেখান থেকে জোর করে সরানো যায় নি। এখানে একটি প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ কাজ করেছিল। নিজদলের কর্মীদেরকে চোখের সামনে নৃশংসভাবে মেরে ফেলতে দেখে অন্যেরা ভয় পাওয়ার বদলে সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। দেখা যাচ্ছে তাদের এই দৃঢ় প্রতিরোধের বিষয়টি তাদের প্রতি বিরুপভাবাপন্নরাও উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনেকে বলছেন এই প্রতিরোধই পুরো ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিএনপি রাজপথে শক্ত অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তিন বাহিনীর প্রধানগণ বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। সন্ত্রাসকারীরা সারাদেশে প্রতিরোধের মুখে পড়ে।

আরেকটি প্রাকৃতিক রক্ষাকবচও কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। যারা হিংস্রতা ও শক্তিমত্ততা প্রদর্শন করছে তাদেরকে মানুষ ভয় পাচ্ছে। দেশের অধিকাংশ নাগরিক কোন দলের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন। অনেকেই সরাসরি বলছেন যে বিদ্যুৎ সংকট ও লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের কারণে যে দলটির বিজয় অনেকটা সুনিশ্চিত ছিল, এ ঘটনায় দলটি জনগণের সমর্থন ও ভালোবাসার বদলে ভীতি ও প্রতিবাদের মুখে পড়েছে। অনেক স্থানে দলটির কর্মীদের মনোবলও ভেঙ্গে গেছে। তারা তাদের সমর্থক ও শুভাকাঙ্খীদেরকে হাজারো প্রশ্নের মুখে পড়ছে। তাছাড়া এদেশে অসংখ্য পরিবার রয়েছে যেখানে পরিবারের বিভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। ১৪ দলের নেতা রাশেদ খান মেননের আপন বোন ৪ দলের মন্ত্রী ছিলেন। একটি শিল্পপরিবারের মালিকদের এক ভাই আওয়ামী লীগের হয়ে গত নির্বাচনে এমপি পদে দাড়িয়েছিলেন, অপর ভাই জামায়াতের নেতা। এ রকম অসংখ্য পরিবারে দলটির সমর্থন বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। জানিনা দলটির নেতৃবৃন্দকে কেউ বিষয়টি বোঝাচ্ছেন কি না। তবে মনে হচ্ছে যে চাটুকার ও উস্কানিদাতারা তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুকেও এভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল। সে ইতিহাস নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

অত্যন্ত বেদনার কথা যে, যে দলটিকে আমরা এ ভূমিকায় দেখছি তার রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ইতিহাস, এ দেশের জন্মের সাথে এবং এদেশবাসীর দেশপ্রেম ও জাত্যাভিমানের আবেগের সাথে তার রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এ রকম একটি দলকে সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিয়ে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। সকলকে বুঝতে হবে যে হিংস্রতা আর শক্তিমত্ততা দিয়ে আর কিছু হলেও নাগরিকদের মন জয় করা যায় না আর মন জয় না করা গেলে রাজনীতির ময়দানে টিকে থাকাই দুরুহ হয়ে পড়ে।